‘ধিক্কার’

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

আজ সারাটাদিন ভাল কাটেনি রহিম মিয়ার। রিক্সার হ্যান্ডেলে মাইক্রোফোন ঝুলিয়ে প্রচার করেছে হাঁসুনির হারানো বিজ্ঞপ্তি। শহরের সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজা-খুঁজি করেও পাওয়া যায়নি হাঁসুনিকে।

পাবে কি করে ? দোকানে স্তুপাকারে সজ্জিত অজস্র ফুলের মাঝে মালি কি খুঁজে পায় কোনটা তার গাছের ফুল? মালি যেমন খুঁজে পায়না কোনটা কোন গাছের ফুল ঠিক তেমনি লোকে-লোকারন্য এ শহরে একটি অবুঝ শিশু নিজস্ব গন্ডি পার হয়ে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া ভার। আর কেই বা কার সন্তানকে দেখে রাখে? যার সন্তান তাকেই আগলে রাখতে হয়। একটু আড়ালে গেলেই -গেল। একদিকে কেউ সমাদর করেনা অন্যদিকে পাচারকারী দলের তৎপরতা। এ দুয়ের দৌরাত্বে অবুঝ শিশুদের প্রাণ ওষ্টাগত। তাদেরই বা দোষ কোথায় ? উন্নয়নের জোয়ারে ভাসা এ দেশের বস্তিতে বাস করে ক্ষুধার দানব। প্রাসাদের মাঝে উপচে পড়া উন্নয়নের আনন্দ আর তার সুফল ও তাদের দখলে। বস্তির মাঝে ক্ষুধার দানবের বিষাক্ত করাল গ্রাসে ফুটন্ত নতুন কলির মত ফুটন্ত কচি শিশুদের কংকালসার দেহের প্রতিকার ও কোন করুনা নেই। এই কংকালসার দেহগুলোতো তাদের মডেল। এগুলো পরিপুষ্ট বা তরতাজা হলে তাদের উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটবে যে! কিন্তু অবুঝ শিশুরা যেমন বোঝেনা তেমনি বোঝেনা ক্ষুধার দানব। হয়তো ক্ষুধার দানব মাথাচাঁড়া দিয়ে বলে উঠেছিল “ দে আমাকে আমার প্রসাদ দে ” নয়তো তোকে পিশে পিশে পঙ্গু করে দেব। ক্ষুধার দানবের সন্তুষ্টির জন্য হয়তো কোনদিকে উঁকি দিয়েছিল। কারও হাতে প্রসাদ দেখে হয়তো পিছু নিয়েছিল। তাই পথভুলে অন্যদিকে চলে গেছে। আর পরিনতি? হয়তো সক্রিয় দলের সদস্যের হাতে নয়তো কোথাও বসে মা...মা...স্বরে কাঁদছে। কাঁদুক তাতে কার কি? যার নাড়ী কাটা ধন তার কানে তো প্রবেশ করছে না। যদি করত তবে শকুনির হাত হতে যেভাবে মুরগী জননী তার সন্তানদের রক্ষা করে সেভাবেই ঝুঁকে পড়ে রক্ষা করত।

হাঁসুনির মা সখিনারই বা দোষ কোথায়? যত দোষ সব কপালের। কপাল গুনে! স্বামী একটি পেয়েছিল কিন্তু হাঁসুনির জন্মের - পরই তাকে ছেড়ে কোথায় যে পালিয়েছে আর কোন খবর নেই। জীবনের প্রয়োজনে বাসায় ঝি এর কাজ নিয়েছে। প্রথম দু’ একদিন হাঁসুনিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে যে কাজের বুয়ার মেয়ে। সাহেবদের সন্তানদের সাথে মিশলে তাদের ইজ্জতের হানি হয়। তাই বস্তিতে রেখেই কাজে যেতে হয়। প্রতিদিন এসে হাঁসুনিকে রহিম মিয়ার ঘরে পায় কিন্তু আজ যে কোথায় গেল তার খবর কেউ জানেনা। সকলেই বলে এখানেই তো ছিল কিন্তু নেই। সারা বস্তিটা যেন হাহাকার করছে হাঁসুনি নেই... নেই... নেই । রহিম মিয়া রিক্সা থেকে নামার পরই গলাকাটা মুরগী যেভাবে ছটফট করে সেভাবে তার সম্মুখে গিয়ে হা-হুতাসের স্বরে বলে উঠল –

– পাইছনি ও রহিম ভাই – পাইছনি?

– নাঃ পাই নাই।

– হায় আল্লাহ গো.....। আমার হাঁসুনি কনে গেল গো...। আমার হাঁসুনিরে আইন্ন্যা দ্যাও খোদা...।

– কান্দস ক্যা...? দামাদেরে খাইছস্ এখন মাইয়্যাডারে খাইলি। তোর খান্দন দ্যাখলে গা জ্বালা করে। কথাগুলো গট গট করে বলে রহিম মিয়া চলে গেল। সখিনা হাঁসুনির নাম ধরে সুরকরে বিলাপ করতে লাগল। দু' একজন সমব্যাথী এসে সান্তনা দিতে লাগল যে হাঁসুনি ফিরে আসবে। সারাটা দিন গড়িয়ে মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হতে চলল কিন্তু হাঁসুনি আর ফিরে এলনা। সখিনা তার ঝুপড়ি ঘরে ফাটা বাঁশির মত বিলাপ করেই চলল আর রহিম মিয়া নিজের ঝুপড়িতে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু ঘুম এলনা। সারাটিক্ষণ শুধু হাঁসুনির ছোট্ট কচি মুখখানি ভেসে উঠতে লাগল। সকালে মেয়েটি দু'টো টাকা চেয়েছিল রহিম মিয়ার কাছে। গত দু' দিন গায়ের জ্বরের কারণে রিক্সা চালাতে পারেনি বলে দিতে পারেনি। অসহ্য ব্যাথায় ছটফট করে উঠল রহিম মিয়া। তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল হাঁসুনি। জীবনের মধ্য গগনে এসেও বিয়ে-শাদী করেনি রহিম মিয়া। হাঁসুনিকে সে নিজ কন্যার মতই দেখত। মেয়েটিও তাকে ছাড়া দু' দন্ড ও কোথাও থাকত না। যতক্ষন ঝুপড়ি ঘরে থাকত হাঁসুনি এসে সাধ্যমত কচি হাতে তাকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করত, হাঁসুনির প্রতি তার রক্তের টান না থাক্ আত্মিক টান তো আছে। অন্তরের টানে রহিম মিয়ার দু'চোখ হতে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। অশুভ আশংকায় সারা মন ভরে উঠল। অস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল " আল্লাহ হাঁসুনিরে তুমি দেইখ্যো "। এমনি করেই প্রভাতের আলো ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে রহিম মিয়া ঝুপড়ি হতে বের হয়ে এল। রাস্তা ঘুরে যখন ডাষ্টবিনের ঐ মাথায় পৌঁছল তখন সকালের সোনা ঝরা রোদ সবেমাত্র উঁকি দিতে ব্যাস্ত। সেই আধো আলোয় রহিম মিয়া দেখল যে ডাষ্টবিনের ও পাশে একঝাঁক প্রকৃতির সুইপার চীৎকার চেচাঁমেচী শুরু করে দিয়েছে। এ দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায় কিন্তু আজ যেন ব্যাতিক্রমী। গোল হয়ে ওরা যেন কি পাহারা দিচ্ছে। মাঝখানে জীবন্ত কি যেন নড়ছে। বেশ কৌতুহলী মন নিয়ে রহিম মিয়া সেদিকে দৌড়ে গেল। সেখানে পৌঁছে রহিম মিয়ার চক্ষু ছানাবড়া। সদ্য জাত একটি শিশু হাত পা নেড়ে খেলা করছে। চোখে-মুখে সারা গায়ে লেপ্টে আছে জন্মকালীন রক্তের দাগ। সেগুলো শুকিয়ে চট চট করছে। তাড়াতাড়ি দু' হাতে শিশুটিকে তুলে নিয়ে দৌড়ে ফিরে এল। সখিনার ঝুপড়ির সম্মুখে এসে চীৎকার করে ডেকে উঠল–

– সখিনা, সখিনা ওঠ, হাঁসুনি ফির‍্যা আইছে। রহিম মিয়ার চীৎকার শুনে কুয়াড় (বাঁশের দরজা) খুলে সখিনা বের হয়ে এল। এসেই বলতে আরম্ভ করল–

– কনে, আমার সোনা মানিক কনে?

– এইত, এইত, তোর হাঁসুনি।

– একি! রহিম ভাই, বাচ্চাডা তুমি কই পাইলা।

– ওই যে দ্যাখতাছস, ওই ডাষ্টবিনে।

– হায়! হায়! কও কি ? বাচ্চাডারে মায় কিতা ?

– হইব, তোর মতই একজন হইব। বাচ্চাডা তো আর আকাশ থাইক্যা টুপ কইর‍্যা পড়ে নাই- মাটি ফাইট্টা ও উডে নাই। কেউ হয়তো ফ্যালাইয়া দিছে।

– ফ্যালাইয়া দিছে! হ্যার বুকে কি কাঁপন জাগে নাই? এমুন পাষান...।

– শুধু পাষানী কস্ ক্যান? ইজ্জত ওয়ালী কইলিনা?

– ইজ্জত ওয়ালী?

– হ ইজ্জত ওয়ালী। বে-ইজ্জতী ঢাকনের লাইগ্যা এই নিষ্পাপ বাচ্চাডারে ফ্যালাইয়া দিছে। আচ্ছা যাউকগা, তোরে একখান হিসটিরি কমু। তার আগে বাচ্চাডারে লইয়্যা মুছাইয়া দে। আমি দুধ লইয়া আসি।

সখিনা বাচ্চাটাকে নিয়ে মুছে দিতে লাগল আর রহিম মিয়া দুধ আনতে চলে গেল। নিষ্পাপ ফুটফুটে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে সখিনার প্রবল মাতৃস্নেহ জেগে উঠল। তার হাঁসুনি ও তো এমনি ভাবেই এসেছিল। এমনি যত্নেই তো তাকে তিল তিল করে বড় করে তুলেছিল। হাঁসুনির কথা মনে পড়তেই আবার ও কান্না এসে জমা হল। চোখ হতে দু' ফোটা তপ্ত অশ্রু টুপ করে বাচ্চাটার মুখের উপর ঝরে পড়ল। তপ্ত অশ্রুর উষ্ণ তাপে বাচ্চাটি চম্‌কে উঠে হাত-পা নাড়াতে লাগল। হয়তো সে বলতে চাইল " আর কেঁদো না মা। আমি, আমিই তোমার হাঁসুনি। নবজন্ম লাভ করেছে। আমাকে তোমার বুকে আশ্রয় দাও মা ফেলে দিও না"। এমনি করে ক্ষনকাল কেটে যাবার পর রহিম মিয়া দুধ নিয়ে ফিরে এল। সখিনা বাচ্চাটির মুখে দুধ তুলে দেওয়ামাত্র তা পান করে বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়ল। বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়ার পরই রহিম মিয়া সখিনাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

– তোরে কইছিলাম না সখিনা, একখান হিসটিরি কমু।

– হ কও রহিম ভাই। তোমার হিসটিরি শুইন্যা মনডা জুড়াই। মনে বহুত ব্যাথা গো রহিম ভাই...।

– থয় হুন...। আমি যখন প্রথম শহরে আইলাম তখন একটা বাসায় দারোয়ান আছিলাম। একদিন রাইতে সাহেব আর মেমসাহেব কই জানি গেল। আপামণি আমারে ডাইক্যা কইল–

– রহিম মিয়া, আমার এক বন্ধু আসবে। তুমি বাসায় পাঠিয়ে দিও। আমি কইলাম– জ্বে আচ্ছা। তারপর একটা ব্যাটা আইলো। দেখতে শুনতে হারামির মত। আমি তারে বাসায় পাঠাইয়া দিলাম। তারপর যাইয়্যা যা দ্যাখলাম তা আর কইবার পারুম নারে সখিনা। – কেন কইবার পারবানা ক্যান? কি দ্যাখলা , কউনা রহিম ভাই। – আমার লজ্জা করতাছে। – তুমার আবার লজ্জা বেশি। কইবানা তো আধা কইলা ক্যান? একেবারে না কইলেই পারতা। – আচ্ছা, আচ্ছা হুন....। দ্যাখলাম, আপামনি আর হেই ব্যাটায় একলগে ঘুমাইতেছে। তারপর থাইক্যা সুযোগ পাইলেই ব্যাটাডা আইত আর আপামনি ও ব্যাটাডারে নিয়া ঘুমাইত। এমনি কইর‍্যা মেলা দিন গেল গা। আমি যাতে না কই হেই লাইগ্যা আপামনি আমারে ট্যাকা দিত। আমিও ট্যাকার লোভে কিছু কইতাম না শুধু চাইয়্যা দ্যাখতাম। একসময় ব্যাটাডা আর আইল না। আপামনি আমারে ডাইক্যা কইলো– রহিম মিয়া, তুমি তো সবই জানো। আমার পেটে বাচ্চা। আমি এখন কি করব?

– যার লগে থাকছেন, হ্যারে খুইল্যা কন।

– সে তো নেই। বিদেশে চলে গেছে।

– হায়! হায়! থয় এখন কি হইব?

– আমার সাথে চলো। ম্যাটারনিটিতে গিয়ে বাচ্চাটা ফেলে দেব।

– কি কন আপা! নিষ্পাপ বাচ্চাডারে মাইর‍্যা ফ্যালাইবেন?

– এছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। আমি আর আপামনি ম্যাটারনিটিতে গেলাম। সেইখানে বাচ্চাটারে যখন প্যাট থেইক্যা বার করলো তখন সেইডা দেইখ্যা আমি কাইন্দা ফ্যালাইছিলাম রে সখিনা। কাইন্দা কাইন্দা আল্লাহরে কইছিলাম " আল্লাহ গো যারা এই বাচ্চাডারে মাইর‍্যা ফ্যালাইল তাগো বিচার কইর‍্যো "। আইজকা যেভাবে আনছি সেইডা ও একই কায়দায় দুনিয়ায় আইছে।

– রহিম ভাই!

– হ রে সখিনা, ইজ্জত বাঁচানের লাইগ্যা হ্যারা নিষ্পাপ ফুলের লাহান বাচ্চা ফ্যালাইয়া দেয়। এই বাচ্চাটার কোন দোষ নেই। হ্যায় নিষ্পাপ। তুই তোর হাঁসুনি মনে কইর‍্যা কোলে তুইল্যা ল। মনে কর তোর হাঁসুনি ফির‍্যা আইছে। ট্যাকা যা লাগে আমি দিমু।

–হ রহিম ভাই, এইডাই তো আমার হাঁসুনি। খিদার জ্বালা সইতে না পাইর‍্যা চইল্যা গেছিল। আবার ফির‍্যা আইছে। আমি কি আমার হাঁসুনিরে ফ্যালাইয়া দিবার পারি, তুমি কও রহিম ভাই...। সখিনার মুখ নিঃসৃত শেষ বাক্য শ্রবনে রহিম মিয়ার মনে আনন্দের লহর বয়ে যেতে লাগল। একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন বাঁচাতে পেরে আর তাকে আশ্রয় দিতে পেরে মহা আনন্দে ঘর থেকে বের হয়ে এল। ইতিমধ্যে বস্তির অন্যান্য প্রতিবেশীরা খবর শুনে ছুটে এসে বাচ্চাটাকে দেখে যে ডাইনী ফেলে গেছে তাকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগল। তাদের একজন বলে উঠল– যদি ফ্যালাইয়াই দিব থয় জন্ম দ্যায় ক্যান? যে কাম করলে ইজ্জত যাইব তা করে কেন? ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ ! ঘেন্না লাগে সেইসব ব্যাটা আর বেটির কথা শুনলে...। বাইরের ইজ্জত ঢাকনের লাইগ্যা সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরে আর ভেতরের ইজ্জত ঢাকনের লাইগ্যা বলি দেয় চান্দের লাহান বাচ্চা গুলানরে.... ধিক্কার তাদের ধিক্কার ।

খঃ মঃ আবদুল গনি, নাটোর